জাতীয় নির্বাচন ২০০৭
জবাবদিহিমূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সুশীল সমাজের উদ্যোগ

নাগরিক ফোরাম

৯ ডিসেম্বর ২০০৬

সহ-আযোজকের বক্তব্য

মতিউর রহমান
সম্পাদক, প্রথম আলো

স্বাধীনতার মাস মার্চে আমাদের নাগরিক সংলাপের যাত্রা শুরু হয়েছিল। এরপর দেশের ১৫টি গুরুত্বপূর্ণ জেলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে এই নাগরিক সংলাপ। এই সংলাপগুলোতে সব পেশা ও শ্রেণীর প্রায় ১৫ হাজার মানুষ অংশ নিয়েছিলেন। তাঁদের সব আলোচনা থেকে আমরা এক উচ্চ দেশপ্রেম ও সমাজচেতনার পরিচয় পেয়েছি। তাঁদের সব আলোচনায় প্রচণ্ড উৎসাহী হয়েছি আমরা।

সেই মার্চের প্রায় নয় মাস পর ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসের এক সপ্তাহ আগে আজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে আমাদের সংলাপের সমাপনী অধিবেশন।

ইতিমধ্যে দেশে নির্বাচন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে কেন্দ্র করে এক গভীর রাজনৈতিক সংকট প্রত্যক্ষ করেছি। ঘনঘন বদলেছে এই সংকটের রূপ। আমরা বারবার আশাহত হয়েছি। আবার ফিরে পেয়েছি আশাবাদ। এই দোলাচলে বিপর্যস্ত হয়েছে অর্থনীতির গতিধারা। একই সঙ্গে শঙ্কায়-উৎকণ্ঠায় থমকে গেছে নাগরিক জীবন। অবশেষে আমরা অনেকটাই আশাবাদী হয়েছি যে, নির্বাচন হতে যাচ্ছে। তারপরও সমস্যা থেকে যাচ্ছে। যেকোনো মুহূর্তে পরিস্থিতি আবার পাল্টে যেতে পারে। গতকাল যেমন ১৪ দলীয় জোট ও কয়েকটি দল দাবি তুলেছে, উপদেষ্টাদের গুচ্ছ প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলেই তারা নির্বাচনে যাবে।

১৯৯৬ ও ২০০১ সালে দু-দুটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কর্মকাণ্ড কিছু সমালোচনা সত্ত্বেও মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার মাত্রাকে বেশ কিছুটা দূর এগিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু এবার তত্ত্বাবধায়ক সরকার বারবার হোঁচট খেতে খেতে চলছে। তবে উপদেষ্টারা অত্যন্ত সাহস আর ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে কাজ করছেন। তারপরও ভবিষ্যতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা থাকবে কি না, এই ধরনের সরকার কাজ করতে পারবে কি না–এসব নিয়ে গভীর সন্দেহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে।

অতীতে আমরা দেখেছি, দলীয় সরকারগুলো ক্ষমতায় ফিরে আসার জন্য নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে নানারকম ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার এসে সেসব বাধা দূর করে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের উপযোগী একটি পরিবেশ তৈরি করে। কিন্তু এবারই তার ব্যতিক্রম হলো। শুরু থেকে প্রধান উপদেষ্টা এবং অপর ১০ উপদেষ্টা একসঙ্গে কাজ করতে পারেননি। উপদেষ্টাদের চেষ্টা বাধাগ্রস্ত হয়েছে বারবার। ফলে এক মাস কার্যত কোনো অগ্রগতি হয়নি। সর্বশেষ, এখন 'সুড়ঙ্গ শেষে আলো' দেখা যাচ্ছে। তবে সেখানেও অনিশ্চয়তা রয়েছে।

নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমরা বিজয় অর্জন করেছিলাম। কিন্তু স্বাধীনতার পর দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমরা এগোতে পারিনি। নানা উত্থান-পতনের ঘটনা ঘটেছে। প্রায় দেড় যুগ আমাদের কাটাতে হয়েছে সামরিক শাসনের মধ্যে। '৯০ সালে আবারও একটি গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আমাদের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে হয়েছে।

গত ১৫ বছরে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নির্বাচিত তিনটি সরকার এসেছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, কোনো সরকারই গণতন্ত্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করতে কোনো উদ্যোগ নেয়নি। বরং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে দুর্বল করতে নানারকম অপচেষ্টায় নিয়োজিত থেকেছে। তারই ফলস্বরূপ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে 'চতুর্থ' জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে আজ দেশে সৃষ্টি হয়েছে গভীর রাজনৈতিক সংকট। এমনকি গণতন্ত্রের ধারা অটুট থাকবে কি না, তা নিয়েই সৃষ্টি হয়েছিল বড় রকমের সংশয়। এখনো সেসব সমস্যা কাটেনি। তারপরও ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সরকার গঠিত হলেও দেশ শাসন প্রক্রিয়ায়, গণতান্ত্রিক চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো বড় পরিবর্তন হবে–আমরা তা ভাবতে পারছি না।

এটি খুবই পরিতাপের বিষয়, এ দেশের মানুষ গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক মুক্তি, মানবাধিকারের যে স্বপ্ন দেখেছিল, স্বাধীনতার ৩৫ বছর পরও সেসব স্বপ্নই রয়ে গেছে। উল্টো তারা তাদের ভবিষ্যৎ নিয়েই সন্দিহান হয়ে পড়েছে, আশঙ্কিত হয়ে পড়েছে। অশুভ, অগণতান্ত্রিক ও উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তি রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করছে। আইনশৃঙ্খলা, প্রশাসন, বিচার বিভাগ ও গণতন্ত্রের ভিত্তিমূলে আঘাত হানার চেষ্টা চলেছে, চলছে। এমনকি গণতান্ত্রিক সরকারেরও আশ্রয়-প্রশ্রয় পেয়েছে উগ্র জঙ্গিগোষ্ঠী।

নব্বইয়ের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পর দেশের মানুষ স্বাভাবিকভাবেই আশা করেছিল, দু-তিনটি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দেশ একটি সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ধারায় পৌঁছে যাবে। কিন্তু আমাদের সে আশা পূরণ হয়নি। আমরা দেখেছি, বিএনপি বা আওয়ামী লীগ যে দলই যখন ক্ষমতায় গেছে, তারাই রাষ্ট্র, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান–সব কিছু কুক্ষিগত করতে চেষ্টা করেছে। তারই অংশ হিসেবে

রাষ্ট্রযন্ত্র ও প্রশাসনকে দলীয়করণের চেষ্টা করেছে। অপরদিকে যারাই যখন বিরোধী দলে থেকেছে, অপ্রাপ্তির বেদনা থেকে তারা তখন সংসদ বর্জন করেছে, হরতাল করেছে। সংসদ বরাবরই অকার্যকর থেকেছে। সেখানে জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয় না। পাশাপাশি আরও একটি বিষয় এ সময়ে স্পষ্ট হয়েছে, রাজনৈতিক দলগুলো যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আসে, ক্ষমতায় আসার পর তা পূরণ করে না। তিনটি সরকারই স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ, বিচার বিভাগ পৃথক্‌করণ, বেতার-টিভির স্বায়ত্তশাসনসহ আরও বেশ কিছু অঙ্গীকার করেছিল, কিন্তু ক্ষমতায় এসে সেগুলো তারা পূরণ করেনি।

এসব কিছুর পাশাপাশি এক সীমাহীন দুর্নীতি আমাদের সর্বতোভাবে গ্রাস করতে চলেছে। পানি-বিদ্যুৎ-গ্যাস, বিমান, রেল, বন্দর, পরিবহন, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাংকসহ এমন কোনো খাত নেই, যেখানে দুর্নীতি তার সর্বগ্রাসী থাবা বিস্তার করেনি। এ পর্যন্ত কোনো দল বা জোটই দেশ থেকে দুর্নীতি কমানোর জন্য সুনির্দিষ্ট ও কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। বিগত বিএনপি-জামায়াত চারদলীয় জোট সরকারের আমলে লোক-দেখানো একটি দুর্নীতি দমন কমিশন করা হয়েছে, যা একটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও অকার্যকর প্রতিষ্ঠান। অদূর-ভবিষ্যতে সেটি কার্যকর হবে বলেও মনে হয় না। কারণ, রাজনীতি এখন মূলত দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতিবিদদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। নিজেদের অপকর্মের বিচার হোক–এমন কোনো ব্যবস্থা গড়ে এঁরা তুলতে চান না।

এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলো যেন দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিদের নির্বাচনে মনোনয়ন না দেয়, সে জন্য নাগরিক সমাজ থেকে জোর দাবি তুলতে হবে। কোটি টাকা খরচ করলেই কোনো দুর্নীতিবাজ ব্যক্তি (যে দলের ব্যানারেই হোক) যেন নির্বাচিত হয়ে আসতে না পারে, সে ব্যাপারে সচেষ্ট থাকতে হবে। কিন্তু এবারও তেমন চেষ্টায় কোনো ফল হবে বলে মনে হয় না। প্রার্থী মনোনয়নে সুবিধাভোগীরাই প্রাধান্য পাবে। চরম সুবিধাবাদী দলগুলোকে পেতেও চেষ্টার শেষ নেই।

দেশের এই সংকটময় রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে একটা বড় ধরনের পরিবর্তন আনার জন্য জনমত সৃষ্টির কোনো বিকল্প নেই। সে জন্য দলনিরপেক্ষ নাগরিক সমাজের সক্রিয়তা অত্যন্ত জরুরি। একইভাবে স্বাধীন সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, স্বাধীন সাংবাদিকতাকে বাধাগ্রস্ত করতে, তাদের কণ্ঠরোধ করার নানা অপচেষ্টা এখনো বিদ্যমান। স্বাধীন সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক প্রচার চালানো হচ্ছে।

স্বাধীন সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আরেকটি বড় অন্তরায় অবাধ তথ্যপ্রবাহের আইন না থাকা। ভারতসহ এ অঞ্চলের কয়েকটি দেশে এ আইন প্রণীত হয়েছে। বাংলাদেশে এখনো ১৯২৩ সালের দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন বা অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট বিদ্যমান। অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করতে আইন প্রণয়নের কথা বললেও বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ কোনো সরকারই এ ব্যাপারে কিছু করেনি। কারণ, সবার ভয় হলো যে তাহলে অনিয়ম, দুর্নীতি, দলীয়করণ, ঋণখেলাপি হওয়াসহ বিভিন্ন অপকর্ম জনসমক্ষে প্রকাশ হয়ে যাবে।

বাংলাদেশের রাজনীতির এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিশেষ করে, দুই প্রধান দল বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে মৌলিক কিছু দুর্বলতা রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অভাব, দলের ভেতরে গণতন্ত্রের চর্চা না থাকা, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো অগ্রাধিকার না পাওয়া, ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থ প্রাধান্য পাওয়া, দুর্নীতি এবং জবাবদিহিতার অনুপস্থিতি। এ সমস্যাগুলো কাটিয়ে উঠতে না পারলে আমাদের গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সামনে এগিয়ে নিতে পারব না।

আমরা দেখছি, দুর্নীতি, জবাবদিহিতার অভাব, রাজনৈতিক অস্থিরতাসহ নানারকম সংকটের মধ্যেও বাংলাদেশ গত ১৫ বছরে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বেশ কিছু সাফল্য অর্জন করেছে। শিশুমৃত্যুর হার কমেছে। একই সময়ে মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে। রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। প্রবাসীদের আয় (রেমিট্যান্স) বাড়ছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এ অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬.৭ শতাংশে। রাজনৈতিক সংকট না থাকলে প্রবৃদ্ধির হার ৮ শতাংশ অতিক্রম করত। এতে আমরা অনেক দূর এগিয়ে যেতাম।

দারিদ্র্যের হারও উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। কিন্তু তারপরও বাংলাদেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে রয়েছে পাঁচ কোটিরও বেশি মানুষ। এ সময়ে বেকারত্বের হার কিছুটা বেড়েছে। এখন প্রায় দেড় কোটি মানুষের নিয়মিত কাজ থাকে না।

মানুষের আয়ের বৈষম্য অনেক বেড়েছে। সবচেয়ে ধনীদের আয় বেড়েছে এবং সবচেয়ে গরিবদের আয় কমেছে।

বাংলাদেশে অর্থনীতি আর সামাজিক ক্ষেত্রে সাফল্য আর ব্যর্থতা পাশাপাশি চলেছে। আমরা এটা নিশ্চিত বলতে পারি, দেশের গণতন্ত্র স্থিতিশীল হলে, দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করা গেলে, আমরা নিশ্চিত আরও সামনে এগিয়ে যেতে পারতাম।

ভবিষ্যতে আমাদের সে সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা এখনো আশাবাদী। প্রশ্ন হলো, আমরা তার জন্য উপযুক্ত একটি রাজনৈতিক পরিবেশ গড়ে তুলতে পারব কি না। দেশের সংঘাতপূর্ণ রাজনীতি, ক্ষমতার রাজনীতি, সমাজে সর্বত্র রাজনৈতিক বিভেদ ও দলাদলি, রাজনৈতিক দুর্নীতি এবং বিদ্বেষপূর্ণ রাজনীতি আমাদের সর্বনাশ করছে। দেশবাসী এ রকম শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি থেকে মুক্তি চায়। আমাদের আকুল আবেদন, দেশের দুই নেত্রীর কাছে এবং আমাদের সব রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে। আসুন, আমরা দেশে একটি সহনশীল ও সমঝোতামূলক পরিবেশ গড়ে তুলি, বিভেদকে বড় না করে ঐকমত্যের ভিত্তি সৃষ্টি করি। প্রগাঢ় অন্ধকারের মধ্যেও আলোর সন্ধান করি, সামনে এগিয়ে চলার পথ খুঁজি।